ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No. 1386-1392
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.06W.144

মানুষের জীবনচেতনার আত্মানুসন্ধান: বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস'

ড. পিন্টু রায়চৌধুরী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.07.2025; Accepted: 18.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

German Philosopher Friedrich wilhelm Nietzsche stated that people wear masks not only before others but also before themselves. This self-deception weakens them, taking them away from the truth. In light of this idea, Badal Sarkar's play 'Baki Itihas' explores the hidden consciousness of human life. The play shows that beyond recorded history, every individual carries within them many unspoken and forgotten events – forming their own silent, private history. People wish to proudly share their joyful memories and even their sorrows or failures to gain attention as part of life's struggle. However, beneath these public memories remain buried events tied to shame, perverted desires, and fear. When such suppressed truths emerge during soul-searching, people often face severe crisis, even choosing the path of suicide.

In Baki Itihas, one character commits suicide while another attempts it. The playwright does not present any specific reason, instead weaving a web of events to reveal the depth of human despair and fragmented consciousness. The play remains deeply relevant today, as it forces us to reflect on the hidden realities within ourselves, in an era obsessed with publicity and outward appearances. Thus, 'Baki Itihas' stands as a powerful work in Bengali drama that transcends genre, exploring self-deception, perverted desires, and the painful truths embedded in human life and death.

Keywords: Self-deception, Soul-searching, Suicide, Perverted desires, Hidden history, Universal publicity

ছাত্রাবস্থায় বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকটি পড়ে যখন কিছুই বুঝতে পারিনি; তখন মনে একটি প্রশ্ন জেগেছিল— সীতানাথ কেন আত্মহত্যা করেছিল? বর্তমান লেখায় আমার ব্যক্তিগত ভাবনা প্রকাশের কেন্দ্রে ওই একই প্রশ্নের উপস্থিতি প্রায় পঁচিশ বছর পর বিন্দুমাত্র স্থান পরিবর্তন করেনি। এ কি শুধুই বোধের তাড়না! কবির ভাষায়— 'আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে/ স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে;' (জীবনানন্দ দাশ, 'বোধ' কবিতা, ধূসর পাণ্ডুলিপি) । আত্মহননের মূলে বোধের তাড়না থাকলেও একটা মানুষ যখন সেই পথ অবলম্বনে বাধ্য হয়; তখন মানুষটির জীবন-বিশ্লেষণে বহুমুখী সমস্যার জটিল তত্ত্ব অবশ্যই সামনে আসে। তবে, সাহিত্যে যে-কোনও আত্মহত্যার পেছনে ভাবাবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তির তাড়নাকেই লেখক চিহ্নিত করেন।

দার্শনিক ব্যক্তিবর্গের কাছে আত্মহত্যার কারণ ভিন্ন হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য দর্শনে দুঃখবাদের প্রবক্তা সোপেনহাওয়য়ারের মতে— অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণাই আত্মহননের পথে মানুষকে ঠেলে দেয়। তাঁর মতে মানুষের জীবনে সমস্ত প্রকার দুঃখের মুলে যে অন্ধ ইচ্ছা, তার থেকে মুক্তি পেলেই দুঃখের থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড' মনে করেন—প্রতিটি মানুষের মধ্যে জীবন-প্রবৃত্তি ও মৃত্যু-প্রবৃত্তি একত্র সহাবস্থান করে। যখনই মৃত্যু-প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে বেশি হয় তখনই মানুষ আত্মহত্যা করে। পাশ্চাত্যের বিখ্যাত দুইজন দার্শনিক কিয়েৰ্কেগার্ড এবং জাঁ পল সার্ত্রে মানুষের জীবনে একঘেঁয়েমি ও শূন্যতাবোধের তত্ত্বকে মৃত্যু প্রবণতার অন্যতম লক্ষণ বলে তুলে ধরেছেন। অস্তিবাদী জীবন-ভাবনায় বিশ্বাসী কিয়েৰ্কেগার্ড মানব অস্তিত্বের মূলে অসহ্য বিরক্তিকর একঘেঁয়েমিকে চিহ্নিত করেছিলেন। সবকিছু পাওয়ার পরেও মানুষের মনে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হতে পারে। তার মনে হতে পারে যা কিছু প্রাপ্তি সবই ক্ষণিকের। সুখ কিংবা দুঃখ কোন কিছুর অস্তিত্বই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সার্ত্র নিজেও মানুষের জীবনের মূল সত্তা রূপে শূন্যতাবোধকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

মানব অস্তিত্বের অন্তর্লীন শূন্যতাবোধকে মানুষ ভয় পায়। প্রায় প্রতিটি মানুষই ছদ্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে নকল অস্তিত্বের রূপটাকেই বড় করে তোলে। যে সব মানুষ অনুভূতির সত্যকে অবলম্বন করে পথ চলতে চায়; তাদের কাছে জীবনের শূন্যতা আর অর্থহীনতাই প্রকট হয়ে ওঠে বেশি করে। অর্থহীন জীবনকে অনেকেই আকস্মিকভাবে খতম করতে চেয়ে আত্মহননের পথে পা বাড়ায়। কিন্তু সাহিত্য স্রষ্টারা এই প্রবণতাকে অস্বীকার করে জীবনকে আলিঙ্গন করার কথা বলেন। তবুও জীবনের সব হতাশা, নৈরাশ্য, ব্যর্থতা ও শূন্যতা চিরতরে মুছে ফেলার বাসনায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেন অনেকে।

বিশ্ব সাহিত্যের স্মরণীয় আত্মহত্যাগুলির মধ্যে বলা যায়— তলস্তয়ের 'আনা কারেনিনা', ফ্লবেয়রের 'মাদাম বোভারি', ভিক্ট্রর হুগোর 'লো মিজারেবেল' উপন্যাসে দোভার মৃত্যু প্রসঙ্গ। দস্তয়েভস্কি'র 'দি পজেজড' উপন্যাসে কিরিলভের আত্মহত্যার ঘটনাটি অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষ তার নিজের বুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা জীবনের স্বাধীনতাকে ঈশ্বরের হাত থেকে কেড়ে নিতে চায়। কিরিলভ মৃত্যুকে ভয় পায় না, তাই ঠাণ্ডা মাথায় সে আত্মহত্যা করে। জীবনের অসহায়তাবোধে আক্রান্ত হওয়ার অন্য ছবি পাই আন্দ্রে মালরোর 'মানুষের ভাগ্য' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের নায়ক চেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যর্থ হওয়ার পরে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। একইভাবে জাঁ পল সার্ত্রের 'রোডস টু ফ্রিডম' উপন্যাসে ম্যাথুও মৃত্যুবরণ করে।

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও আত্মহত্যার নজির খুব একটা কম নয়। ব্যক্তি চরিত্রের অপ্রাপ্তি ও অসহায়তা বোধের পরিণামে আত্মহত্যা করতে দেখা যায় 'বিষবৃক্ষ'-র কুন্দনন্দিনী, 'চতুরঙ্গ'-র ননীবালা ও দামিনী, 'মালঞ্চ' উপন্যাসের নীরজা, 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-য় যাদব পণ্ডিত, বুদ্ধদেব বসুর 'শেষ পাণ্ডুলিপি'-র নায়ক বীরেশ্বরকে, এরই পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সোমেনচন্দ্র নন্দীর 'উদাস' নাটকটি। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র উদাস বেকার এবং নিঃসঙ্গ যুবক রূপে চূড়ান্ত হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে জীবনের অর্থহীনতাকে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করে। নিজের শরীরে ও মনে প্রচণ্ড বেদনাবোধ নিয়ে সে ক্রমশই প্রেম, বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতি আস্থা হারিয়ে আত্মহননের পথ খুঁজে নেয়। অথচ এই নাটকেই তার বন্ধু দীপায়ন, প্রেমিকা কাবেরী, কৃতি ছাত্র মানিক, ও কবি বন্ধু, এরা প্রত্যেকেই ব্যর্থতা ও পরাজয়বোধ নিয়েই বেঁচে থাকে।

আমাদের আলোচ্য 'বাকি ইতিহাস' নাটকে কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন প্রতিষ্ঠিত মাঝবয়সী পুরুষের আত্মহত্যার কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। তবে লেখকের গল্প বলার ঢঙটি অভিনব। সাধারণ মধ্যবিত্ত দাম্পত্যের গল্প শুরু হয়েছে রবিবার ছুটির দিনে। নাটকটির মধ্যে তিনটি পর্যায় বা অঙ্ক আছে। কিন্তু কোনও অঙ্কে চরিত্রের আগমন ও অপসারণ প্রথাগত নাটকের নিয়ম অনুসারে রচনা করা হয়নি। এখানে নির্দিষ্ট করে তিনটি পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও কার্যকারিতা উল্লেখ করা হল—

প্রথম পর্যায়/প্রথম অঙ্ক:

বাহ্যিক অভিঘাত: খবরের কাগজে আত্মহত্যার সংবাদ পাঠ এবং তার কারণ অনুসন্ধানে শরদিন্দু বাসন্তীর সংসারে প্রাত্যহিকতার ছবি। একটা রবিবারের ছুটির দিনে স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ কথাবার্তা।

অভ্যন্তরীণ অভিঘাত: শরদিন্দুর মানসপটে সীতানাথের দাম্পত্য জীবন, কণার পারিবারিক জীবনের জটিল টানাপোড়নের ছবি। কণার অর্থকষ্টে সীতারামের মিথ্যে প্রলোভনের মুখোশ খসে পড়া।

প্রতিক্রিয়া: কণার বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া সাংসারিক বাঁধন ছিন্ন করা। প্রথম অঙ্কের যবনিকা পতন ঘটে।

দ্বিতীয় পর্যায়/দ্বিতীয় অঙ্ক:

বাহ্যিক অভিঘাত: অধ্যাপক শরদিন্দুর প্রাত্যহিক জীবনের ছবি, বাসন্তীর অর্ধ সমাপ্ত গল্পকে শেষ করার প্রচেষ্টা। বক্তা শরদিন্দু শ্রোতা বাসন্তী।

আভ্যন্তরীণ অভিঘাত: মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক সীতানাথের অস্বাভাবিক জীবন-সংকটের কাহিনিকে বাস্তবনিষ্ঠ করে তোলার বাসনা, বাসন্তীর গল্প লেখার প্রেক্ষিত পছন্দ না হওয়ায়, অন্তরের টানে শরদিন্দুর কলম ধরা।

প্রতিক্রিয়া: সীতানাথের মনের অসুখের আত্মানুসন্ধান এবং নিজের ভুল সংশোধনের জন্য দড়ি হাতে নেওয়ার দৃশ্য। এরপর স্টেজে আলো নিভে যায়।

তৃতীয় পর্যায়/তৃতীয় অঙ্ক:

বাহ্যিক অভিঘাত: গল্প সৃষ্টির উল্লাসে অধ্যাপক শরদিন্দুর অনাকাঙ্ক্ষিত উদ্বেগ-উত্তেজনা, নিজের স্ত্রী বাসন্তীর সঙ্গে সীতানাথের মৃত্যুর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা।

অভ্যন্তরীণ অভিঘাত: সীতানাথের কল্পিত মূর্তি শরদিন্দুর সুখী জীবনের ভিত নাড়িয়ে দেয়। বাকি ইতিহাসের অভিঘাতে শরদিন্দু নিজেই ফাঁসির দড়ি হাতে তুলে নেয়।

প্রতিক্রিয়া: অধ্যাপক শরদিন্দু মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, মৃত্যুর জন্য উদ্যত হয়। ঘরের ল্যাম্প নিভে যায়, বাসুদেব প্রমোশনের খবর নিয়ে আসে।

এই নাটকটি নিয়ে সমালোচকের মধ্যে বিভ্রান্তির অন্ত নেই। যেহেতু ১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে তখন অ্যাবসার্ড নাটকের বিশেষ প্রচলন হয়েছিল; তাই ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে সুদূর নাইজেরিয়ায় বসে লেখা বাদল সরকারের নাটকটিকে অনেকে অ্যাবসার্ড বা উদ্ভটনাটক বলেন। বাংলা অ্যাবসার্ড নাটকের প্রতিশব্দ রূপে 'কিমিতিবাদী' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

> "আমি বার বার নানা জায়গায় বলেছি একটা নাটক তখনি অ্যাবসার্ড হয় যখন তার মধ্যে একটা ফিলোসফি অপ অ্যাবসার্ডিটি থাকে। কিন্তু আমার নাটকগুলোর মধ্যে তা ছিল না।"[১]

আসলে বাংলা নাটকে সাতের দশকের উত্তাল রাজনীতির অভিঘাতে অনেকেই তখন বাংলা নাটককে একটি বৃহৎ সামাজিক কর্ম বা আদর্শ ভেবে নিয়েছিল। একমাত্র যাঁরা সমাজ বদলের জন্য নিরন্তর নাট্যাঙ্গিক পরিবর্তনের ভাবনা করেছিলেন; বাদল সরকার তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। প্রফেশনাল থিয়েটারে মুনাফা পাওয়ার জন্য সুযোগ থাকলেও সমস্ত প্রলোভনকে হেলায় অবজ্ঞা করে বাদল সরকার যে বিকল্প থিয়েটারের ব্যবস্থা করেছিলেন তার নামকরণ করা হয়েছে থার্ড থিয়েটার। অথচ বাদল সরকার এই প্রসঙ্গে নিজেই বলেছেন—

> "কোনো একটা বিকল্প থিয়েটার হলে লজিক্যালি তার নাম হতে পারে থার্ড থিয়েটার।"[২]

অর্থাৎ অ্যাবসার্ড নাটক হিসেবে নিজের রচনাগুলিকে ধরে নেওয়ার বিপক্ষেই ছিলেন বাদল সরকার। তাঁর মনে হয়েছিল, শহুরে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে সমাজ বদলের কথা থাকলেও; গ্রামে গঞ্জের শ্রমিক-কৃষক বা খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের কাছে এই আঙ্গিক পৌঁছে দেওয়া যাবে না। স্টেজ ভাড়া, স্থানিক সংকীর্ণতা, দর্শক সংখ্যার সীমায়তি, হলের ক্রমবর্ধমান ভাড়া, মেকআপ-কস্টিউমের বাহুল্য, আলো পাখার ব্যবহার ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে তিনি পরে মুক্তমঞ্চের ভাবনা করেছিলেন। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—

> "থিয়েটার মানুষের ক্রিয়া, human action—মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ। মানুষের ঘাড়ে ক্রেতার ভূমিকা, বিক্রেতার ভূমিকা চেপে গেলে সত্যিকারের থিয়েটারই ব্যহত হয়। হ্যাঁ, এ থিয়েটারেই সম্ভব।"[৩]

মানুষের জন্য থিয়েটার করবেন বলেই তাঁর নাটকে মানুষের কথা ফিরে ফিরে আসে। মানুষের অর্ন্তজগতের বিরক্তি তথা বিকারকে কেন্দ্রে রেখে বৃহত্তর সমাজে নৃশংসতার ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন তাঁর 'বাকি ইতিহাস' নাটকে। এই নাটকটি লেখার পূর্বে তিনি একাধিক চাকরি ছেড়েছেন, রাজনৈতিক চাটুকারিতা ছেড়েছেন, বৈষয়িক উপার্জনের আশা পরিত্যাগ করেছেন, তাঁর নিরন্তর সংগ্রামী জীবনের কথা 'পুরনো কাসুন্দি' গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা আছে। 'বাকি

ইতিহাস’ নাটকে মানব জীবনের অর্ন্তদ্বন্দ্ব আবিষ্কারের ভাবনা বাদলবাবুর নিরন্তর সংগ্রাম জীবনেরই ফসল। অধ্যাপক বিপ্লব চক্রবর্তী এই নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> “বাকি ইতিহাস নাটকটিতে মানব সমাজ ও মানব সভ্যতার স্বরূপ উন্মোচক আলোকপাত ঘটেছে। এর দুটি বিশেষত্ব রয়েছে। প্রথম, মানবজীবন ও মানবিক অবস্থার বিষয়ে একজন নাট্যকারের পর্যবেক্ষণ ও তজ্জাত ফলবর্ণন; দ্বিতীয়, একজন নাট্যকর্মীর নিজস্ব প্রয়োগ পদ্ধতিতে নাট্যসৃষ্টি তথা শিল্পসৃষ্টি। উভয় দিক থেকেই এই নাটকটির গুরুত্ব অপরিসীম।”[৪]

এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র সীতানাথের আত্মহত্যার খবরে বিস্মৃত শরদিন্দু-বাসন্তী। রবিবার সকালে খবর কাগজ খুলেই এই মৃত্যু দেখে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় প্রবিষ্ট হয়। পর্যালোচনা করে সীতানাথ-কণার দাম্পত্য জীবনকে। তাদের এই আলোচনার কারণ—

ক. সীতানাথ ও কণা অধ্যাপক দম্পতির পূর্ব পরিচিত, তারা একবার ভ্রমণের সহযাত্রী ছিল।

খ. শরদিন্দুর স্ত্রী বাসন্তী গল্প লেখিকা। সে একটা ভালো প্লট খুঁজছিল, সীতানাথের আত্মহত্যার বিষয়টি প্লটের স্থান নিল।

গ. সীতানাথ-কণা, শরদিন্দু-বাসন্তী, দুজনের দাম্পত্যই নিঃসন্তান ও মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী।

ঘ. উভয় দাম্পত্য সম্পর্কেই স্বামী-স্ত্রী কেন্দ্রিক একক জীবনের ছবি ধরা পড়ে। তাদের পরিবারে অন্য কোনও সদস্য নেই।

ইতিপূর্বে নাটকের তিনটি অঙ্কের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এখন দেখব সেখানে লেখক কোন বার্তা দিতে চেয়েছন। লেখক সচেতন শিক্ষিত মানুষের জীবন চক্রের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা এখানে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র ‘উটপাখি’ কবিতার দুটি পংক্তি স্মরণ করতে পারি—

> “কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত?
> উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
> প্রাকপুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
> বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।”[৫]

শিক্ষা ও সচেতনতাবোধ মানুষের ধর্ম হলেও মধ্যবিত্ত লোভ ও ভোগাকাঙ্খায় মত্ত হয়ে মানুষ নৃশংসতার ইতিহাস ভুলে যায়। প্রত্যহ সাংসারিক খুঁটিনাটি কাজে লিপ্ত হয়ে মিথ্যে সুখ-বাসনাকে আঁকড়ে ধরতে চায়। প্রধান দুটি দাম্পত্য সম্পর্ককে পাশে রেখে নাট্যকার মানুষের আত্মানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন এই নাটকে। এই নাটকের চরিত্রগুলোকে আমরা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি—

প্রত্যক্ষ চরিত্র: সীতানাথ ও কণা এবং শরদিন্দু ও বাসন্তী।

পরোক্ষ চরিত্র: নিখিল, বাসুদেব, বিজয়, বিধভূষণ, কণার বৃদ্ধ বাবা।

প্রথম অঙ্কে দেখা যায় শরদিন্দু এবং তার কলেজের সহকর্মী বাসুদেব দুজনই বাসন্তীকে সীতানাথের মৃত্যু প্রসঙ্গে একটা গল্প লিখতে বলেছে। তাদের কথা শুনে বাসন্তী গল্প লিখতে বসে সীতানাথের স্ত্রীর চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষার চিত্র তুলে ধরে। কণা কিভাবে তিলে তিলে টাকা জমিয়ে নিজের জন্য একটা বাড়ি বানাতে চায়। উল্টোদিকে সীতানাথের অক্ষমতার ছবিটাও আঁকে। সে কণার সব জমানো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে খরচ করে দেয়। তাছাড়া সামান্য অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা এক টুকরো জমি পর্যন্ত ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রেখে টাকা ধার নেয়। এমতাবস্থায় প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ভাবলেশহীন ভাবে সীতানাথের স্ত্রী কণা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, তারই বড়লোক বন্ধু নিখিলের গৃহে। গৃহত্যাগ প্রসঙ্গে কণা নিজেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেয়। নাটকের প্রথম অঙ্ক থেকে কণা সীতানাথের সামান্য কথোপকথনের অংশ তুলে ধরলাম—

> “কণা: চলে যাচ্ছি।
> সীতানাথ: চলে যাচ্ছো, কোথায়?
> কণা: তা নিয়ে তোমার কী দরকার?
> সীতানাথ: কণা, তোমার কাছে কি জমি-বাড়িটাই সব চেয়ে বড়ো? আমি কিছু নই?...

কণা: না, তুমিও নেই আর। মিথ্যে বলে বলে, চুরি করে—তুমিও নষ্ট হয়ে গেছো। জমি, বাড়ি, তুমি—সব চলে গেছে। স—ব।
সীতানাথ: তুমি কোথায় যাচ্ছো?...
কণা: মেজদি যে পথে গেছে।
সীতানাথ: কণা!
কণা: সত্যি কথা বললাম। ঐ আমাদের পথ। ঐটাই সত্যি। তুমি মিথ্যে ছিলে।”[৬]

কণা মুহূর্তের মধ্যে সীতানাথকে ছেড়ে তারই বন্ধু নিখিলের কাছে চলে যায়। স্বভাবতই কণাকে দুশ্চরিত্রা নারী মনে হলেও প্রচণ্ড দারিদ্রের লড়াইতে হেরে যাওয়া একজন নারীকেই নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন। বাড়ি ছাড়ার প্রাক-মুহূর্তে কণা অবলীলায় সেই কথাটি বলে যা সীতানাথের জীবনের সবথেকে বড় ট্রাজিক সত্য। কণাকে ভালো রাখার জন্যই সীতানাথের এত ত্যাগ ও মিথ্যেকথা বলা। কারণ, কণাদের পরিবার দারিদ্রতার অতলে নিমজ্জিত হয়েছিল। তার মেজ দিদি বাড়ি ছেড়ে ভ্রষ্টা হয়েছিল, লম্পট বাবা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল, কণার মা’ও মারা গিয়েছিল। এই নিদারুণ কষ্টের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সীতানাথ মিথ্যে বলেছিল কণার কাছে। তার মদ্যপ বাবা বেঁচে থাকার পরেও মৃত ঘোষণা করেছিল। অথচ সেই কণাই তাকে হঠাৎ বলে বসে—

> “তোমাকে আঁকড়ে—একটা মিথ্যেকে আঁকড়ে পড়ে থাকতাম—শুধু বাবার কাছে মুখ রাখবার জন্য। কিন্তু বাবা নেই, আর আমার লজ্জা নেই।”[৭]

যার জন্য সীতানাথ মিথ্যে বলেছিল, সেই কণার গৃহত্যাগের পর সীতানাথের জীবনের গ্লানি আর অর্থহীনতা তাকে অন্তরে বিদ্ধ করল, তাই সীতানাথ একগাছা লম্বা শণের দড়ি হাতে নিয়ে আত্মহননের পথে এগিয়ে গেল।

দ্বিতীয় অঙ্কের শুরুতেই দেখা গেল বাসন্তীকে তার স্বামী শরদিন্দু বোঝানোর চেষ্টা করছে— গল্পটা জমে ওঠেনি কারণ সীতানাথের মৃত্যুর আরও বাস্তবনিষ্ঠ কারণ খোঁজা উচিত বলে তার মনে হল। ফরমায়েশি গল্প লিখে বাসন্তী অল্প টাকা পায়, গভীর বিশ্লেষণ তার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু, শরদিন্দু এই গল্পের গ্রহণযোগ্যতা আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে নিজেই লিখতে বসে পড়ল। শরদিন্দুর মনে হয়েছিল— সীতানাথের মৃত্যু এত অল্প কারণে হতে পারে না। শরদিন্দু ভাবতে শুরু করল— নাবালিকা ফর্সা বালিকাদের প্রতি সীতানাথের চারিত্রিক দুর্বলতার কথা। একদা চম্বলগড়ের জঙ্গলে কর্মসূত্রে গিয়ে সীতানাথ প্রচণ্ড ভালবেসে ফেলেছিল বারো বছরের বালিকা মেয়ে পার্বতীকে, সেই পার্বতী নৃশংস শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিল। সীতানাথ ছুটে গেলেও দুর্ঘটনার হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারেনি। তারপর কণা সীতানাথকে নিয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিল। বিজয় কণাকে চেপে ধরলে কণাও স্বীকার করে সেই চম্বলগড়ের দুর্বিষহ দিনগুলির কথা। সেখান থেকে আসার পর কণার সঙ্গেও সমস্ত সম্পর্ক সীতানাথ ত্যাগ করেছিল। স্ত্রী হিসেবে কণার জ্বালাময় আক্ষেপোক্তি—

> “চম্বলগড়ের পর থেকে আপনার বন্ধু ব্রহ্মচারী, আজ দশ বছর—নিন এবার, এর থেকে কী বোঝবার আছে আপনার বুঝুন।”[৮]

সীতানাথ স্কুলের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকত। বিজয়ের এই কথাগুলি জিজ্ঞাসা করবার কারণ ছিল সীতানাথের অস্বাভাবিক ব্যবহার এবং স্কুলের ছাত্র প্রকাশকে লঘু দোষে বহিষ্কার করে দেওয়ার জেদ। স্কুলের বর্ষিয়ান সেক্রেটারি বিধুভূষণবাবু অনুরোধ করার পরেও প্রকাশকে কেন্দ্র করে নিজের অসম্ভব আক্রোশ ব্যক্ত করে সীতানাথ। বিজয় তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল— শুধুমাত্র নাবোকোভের লেখা ‘লোলিটা’ গ্রন্থ পড়ার জন্য এত বড় শাস্তি কোনও ছাত্রকে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সীতানাথের মনের অন্ধকার কুঠুরিতে নাবালিকার ওপর পাশবিক অত্যাচারের দানবীয় ছবি জলজ্যান্ত হয়ে উঠেছিল। সীতানাথের উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য—

> “একটা বিষাক্ত জীবাণু মনের মধ্যে হাজার হাজার, লাখ লাখ হয়ে উঠেছে। সমস্ত মন ছেয়ে ফেলেছে বিষ দিয়ে। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। যন্ত্রণায় ছটফট করেছি। প্রাণপণে লড়াই করেছি। পালিয়ে আসতে চেয়েছি। পারিনি। ওকে সরিয়ে দিতে চেয়েছি। মেরেছি! কিন্তু কি যে হয়ে গেলো! কেন মেরেছিলাম? কেন ও জঙ্গলে গেলো? কেন? কেন?”[৯]

সীতানাথ বিধুবাবুর নাতনি গৌরীকেও প্রচণ্ড ভালোবাসে। তার ভয় হয় লোলিটার মতো, পার্বতীর মতো, গৌরীর সঙ্গেও হয়তো ওই একই জিনিস হবে। বিজয় তাকে নিপাট যুক্তি দিয়ে বোঝায় এমনটা কখনোই সম্ভব নয়। কিন্তু,

কোনও এক গভীর অসুখ সীতানাথের অন্তর কুরে কুরে খায়। তাই কণাকে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে পাঠিয়ে বিজয়ের হাতে বিতাড়িত ছাত্রকে ক্লাসে পুর্নবহালের চিঠি লেখে, ওই রাতেই বিধুবাবুর কাছে দিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করে। সীতানাথের উৎকণ্ঠা ও নিজের কৃতকর্মের জন্য প্রবল অর্ন্তদহনের চিত্র তার জীবন সচেতনতারই ফসল। সীতানাথ শিক্ষিত সচেতন একজন সাধারণ মানুষ। তার শিক্ষা, চিন্তা ও চেতনার গভীর তলদেশে সর্বদাই ক্রিয়াশীল। তাই সে কেবল নিজে ভালোভাবে বাঁচতে চায় না, পৃথিবীর সব মানুষকে ভালোভাবে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলে। নিজে ধার করে সহধর্মিনী কণার পারিবারিক জীবন-সংকটকে দূর করার চেষ্টা করে। কণার মনের ওপর যেন কোনও আঘাত না পড়ে তাই লম্পট শ্বশুরের পরিচয় অবলুপ্ত করে। সীতানাথ ক্লাসে ভালো পড়াতে পারে, মানুষকে বোঝাতে পারে, সমাজের জন্য ভাবতে পারে, কিন্তু পারে না কেবল নিজেকে বোঝাতে। তাই দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সীতানাথ হাতে দড়ি তুলে নেয় আত্মহননের উদ্দেশ্যে।

তৃতীয় অঙ্কের শুরুতেই দেখা যায় শরদিন্দু-বাসন্তীকে। শরদিন্দু নিজের গল্পটা বাসন্তীকে বোঝাতে চায়। তারা দুজনেই সীতানাথের জীবন ভাবনার শরিক হয়ে পড়ে—

> “শরদিন্দু: আমি বোধহয়—আমরা বোধহয় সীতানাথের আত্মহত্যা নিয়ে একটু বেশি মাথা ঘামিয়ে ফেলেছি।
> বাসন্তী: হ্যাঁ, কেমন যেন ঢুকে গেছে মাথায়।
> শরদিন্দু: (চেষ্টা করে হেসে) সীতানাথের ভূত ঘাড়ে চেপেছে বোধহয়।”[১০]

একটি গল্প খবরের কাগজে সত্যি, অন্য একটি গল্প বাসন্তী-শরদিন্দুর ভাবনায় সত্যি। রবিবার মধ্যরাত পর্যন্ত এই বিষয়ে নিবিড় আলোচনার শেষে, পরের দিন কলেজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে শরদিন্দু ঘুমোতে গেলে তার ঘুম আসে না। আধো আলো-আবছায়ায় শরদিন্দু পরিষ্কার দেখতে পায় সীতানাথ তার ঘরে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গল্পের সীতানাথ এভাবেই শরদিন্দুর শরীরে-মনে ঢুকে পড়ে। দুজনের জীবনের গল্প মিলেমিশে যায়। ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়া, কষ্ট করে পড়াশোনা করা, চাকরি পাওয়া, বিয়ে করা, ইত্যাদি সমস্ত কিছু। শরদিন্দু উত্তেজিত হয়ে ওঠে সীতানাথের মুখে এই কথা শুনে—

> “তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু?”[১১]

শরদিন্দু বলে সে জীবনকে ভালোবাসে, তাই আত্মহত্যা করেনি। সীতানাথ শরদিন্দুকে বলে সেই জীবন মিথ্যে। শরদিন্দুর গুছিয়ে রাখা পেপার কাটিং দেখিয়ে তাকে সীতানাথ বলে বাকি ইতিহাসের ছবি। সেই ছবিতে ফুটে ওঠে মহাভারতের দুঃশাসনের রক্তপান, ভীমের প্রতিশোধ, প্রাচীন মিশরের ছবি, ফারাও’এর আদেশে পিরামিডের জন্য পাথর তুলছে সাধারণ মানুষ, রোমান সম্রাটের নৌবহর, ক্রীতদাসদের দাঁড় টানার ছবি, রোমের কলোসিয়ামে ক্রীতদাসদের সিংহ দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে, মধ্যযুগের ইউরোপ, নেপোলিয়নের জয়যাত্রা, মরুভূমিতে শীকলে বাঁধা ক্রীতদাস, হিটলারের কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছবি, মেয়েটাকে পোড়ানোর ছবি, বাচ্চা ছেলেটার হাত কাটা পড়ার ছবি, এইসব মৃত্যুর ইতিহাস মানুষের জীবনের উল্টো পিঠে সমান সত্যি। সীতানাথ উদাত্ত গলায় বলে যায়—

> “না। তুমি কিছু করতে পারো না। আমি কিছু করতে পারিনি। কারো কিছু করবার নেই। নির্যাতন হত্যা দাঙ্গা যুদ্ধ—সব কিছু চলবে, সব কিছু মানুষই করবে—তবু মানুষের কিছু করবার নেই। যে মানুষ শান্তিতে দু’বেলা খেতে পেলে খুশি, সে-ই অন্য মানুষের পেটে বেয়নেট গুঁজে দেবে। যে বৈজ্ঞানিক একটা জন্তুর যন্ত্রণা চোখে দেখতে পারে না, সে-ই একসঙ্গে লক্ষ মানুষ ধ্বংসের অস্ত্র তৈরি করবে।”[১২]

বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের সংকট মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত মানুষের ভালো থাকার মিথ্যে বর্ম খসে পড়ে। শরদিন্দু হাতে দড়ি তুলে নিয়ে আত্মহননের পথে এগিয়ে চলে। আত্মহত্যার মুহূর্তে তার সহকর্মী বাসুদেব এসে প্রোমোশনের খবর দেয়। আত্মমগ্নতার ঘোর কাটিয়ে শরদিন্দু জীবনের কক্ষপথে আবার ফিরে আসে। জীবনের উল্লসিত মত্ততায় সীতানাথকে নিয়ে লেখা কাগজগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সেগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে চা করার জন্য বলে বাসন্তীকে। শরদিন্দুর মনে সীতানাথের মৃত্যু প্রবল আঘাত হানলেও, শেষ পর্যন্ত এই নাটকে জীবনের জয়গান ঘোষিত হয়।

আত্মহত্যা করার পেছনে একাধিক যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু আত্মমগ্নতায় বিলীন হয়ে মানুষ যেমন আত্মহত্যার পথে পা বাড়ায়; তেমনি জীবনের কলতানে আত্মমগ্ন মানুষের নিদ্রাভঙ্গ হয়। সীতানাথের জীবনের গল্পটিকে শরদিন্দুর কাছে একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। সীতানাথ আত্মহত্যা করলেও শরদিন্দু জীবনকে স্বীকার করে, শক্ত মুঠোয় কপালটাকে চেপে ধরে ভীষণ যন্ত্রণায় কাঁপতে থাকে। শরদিন্দুর এই যন্ত্রণা আসলে বাকি ইতিহাসের চেতনা বহন করে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকার যন্ত্রণা। যার কঠিন সত্য উঠে আসে নাটকের অন্তিম সংলাপে যা শরদিন্দুর অনুভবে স্বরালাপও বটে—

"ইতিহাস বাসুদেব! বাকি ইতিহাস! বাকি ইতিহাস!"[১৩]

শরদিন্দু এবং সীতানাথ এরা দুজনেই পয়সার এপিঠ আর ওপিঠ। মনুষ্য জীবনের আত্মানুসন্ধানে নিবিষ্ট হয়ে বাদল সরকার আবিষ্কার করেছিলেন জীবনের দুই রূপ। সত্যের বিপরীতে মিথ্যে অর্থাৎ মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন অথবা জীবনের অপর নাম মৃত্যু; দুটোই সমান সত্যি। তাই কে আত্মহত্যা করেছে সেটা এই নাটকে বড় কথা নয়; কেন আত্মহত্যা করেছে সেই অভিলক্ষ্যের অনুসন্ধানই এখানে প্রধান। এই নাটকে মনুষ্য জীবনের আত্মানুসন্ধান অনুষঙ্গটি যথার্থই সার্থক। অজস্র বইয়ের পাতায় সমাজ বিবর্তনের রাশি রাশি ইতিহাস ধরা থাকলেও, মানুষের জীবনচেতনার অতলে ফল্গুধারার মতো বহমান থাকে 'বাকি ইতিহাস'।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সঞ্জীব। সম্পাদক। কথাকৃতি স্মারক নাট্যপত্র। কলকাতা, মার্চ ২০১০, পৃ: ১৬।
২. সরকার, বাদল। নাট্য সঞ্চয়ন। রক্তকরবী, কলকাতা, বইমেলা ২০০৫, পৃ: ২৩।
৩. সরকার, বাদল। থিয়েটারের ভাষা। রক্তকরবী, কলকাতা, বইমেলা ২০০৫, পৃ: ৮৬।
৪. চক্রবর্তী, বিপ্লব। বাদল সরকারের বাকি ইতিহাস মননে অন্বেষণে। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৬, পৃ: ১৩।
৫. বসু, বুদ্ধদেব। সম্পাদক। সধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৪, পৃ: ১৩।
৬. সরকার, বাদল। নাটক সমগ্র-দ্বিতীয় খণ্ড। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি: কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪০৯, পৃ: ৬১।
৭. তদেব, পৃ: ৬২।
৮. তদেব, পৃ: ৭৬-৭৭।
৯. তদেব, পৃ: ৮০।
১০. তদেব, পৃ: ৮৫।
১১. তদেব, পৃ: ৮৮।
১২. তদেব, পৃ: ৯৪।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. আচার্য, অনিল। (সম্পাদক)। মার্কসীয় দর্শনের পটভূমি: ভাববাদ খণ্ডণ। অনুস্টুপ, কলকাতা, ২০০৬
২. কুমার ঘোষ, অজিত। বাংলা নাটকের ইতিহাস। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫
৩. কুমার মিত্র, দিলীপ। আধুনিক ভারতীয় নাটক। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫
৪. চক্রবর্তী, রথীন (সম্পাদিত)। রাজনৈতিক থিয়েটারের অভিযান, দারিও ফো, পলিটিক্যাল থিয়েটার। নাট্যচিন্তা ফাউন্ডেশন, কলকাতা, ২০০৮
৫. চক্রবর্তী, বিপ্লব। বাদল সরকারের বাকি ইতিহাস মননে অন্বেষণে। পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৬
৬. চৌধুরী, দর্শন। নাট্যব্যক্তিত্ব বাদল সরকার। একুশ শতক, কলকাতা, ২০০৮
৭. বসু, সৌমিত্র। বাংলা গ্রুপ থিয়েটার নাট্যচর্চা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। পূর্বাশা, কলকাতা, ২০০৬
৮. বিশ্বাস, দেবব্রত সম্পাদক। বাংলা নাট্যচর্চা ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। বাংলার মুখ, কলকাতা, ২০১২
৯. মজুমদার, সমরেশ ও গিরি সত্যবতী (সম্পাদিত)। বাংলা প্রবন্ধ সঞ্চয়ন। অয়ন্তিকা ঘোষ: থার্ড থিয়েটার, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০৬
১০. মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশঙ্কর। নাট্যতত্ত্ব বিচার। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ১৪০১
১১. মিত্র, কুন্তল। অ্যাবসার্ড নাটক মাতৃভাষায় বিভাষায়। অফবিট পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫